মিত্রোখিন রহস্য - ৪

ভাসিলি মিত্রোখিন। কেজিবির এই কর্মকর্তা অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল নথিপত্র নকল করে তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখতেন। এতে ঠাঁই পেয়েছে ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু ঘটনাপ্রবাহ। সম্প্রতি প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভ অবলম্বনে লিখেছেন

মিজানুর রহমান খান

পাকিস্তানের ভাঙন ছিল কেজিবির দর্শন

মিত্রোখিন আর্কাইভ বলেছে, সোভিয়েত নেতা যোশেফ স্টালিন মন্তব্য করেছিলেন, 'এ ধরনের (পাকিস্তান) রাষ্ট্র দীর্ঘদিন টিকতে পারে না।' চল্লিশের দশকের শেষে সোভিয়েত-ভারত বিশেষজ্ঞরা ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরিকল্পনার নিন্দা করেন। তাদের যুক্তি ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধর্মীয় নিধনযজ্ঞকে উসকে দেয় এবং তার অজুহাতে দেশভাগ করে। অথচ ভারত বিভক্তি সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় তারা উল্লেখ করে, পাকিস্তান একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা দুই অংশের বিভাজন একটি অসম্ভব ভৌগোলিক অবস্থান। স্টালিন পাকিস্তানের অভ্যুদয়কে 'আদিম' এবং ক্রুশ্চেভ মনে করতেন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ 'দুই হিন্দুস্তানি রাষ্ট্রকে' তিক্ত শত্রুতে পরিণত করেছে *(মস্কো অ্যান্ড দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ, বিজয় সেন বুধরাজ, এশিয়ান সার্ভে, মে ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৪৮২-৮৩)*।

কেজিবির ফার্স্ট চিফ [ফরেন ইন্টেলিজেন্স] ডাইরেক্টরেটের সংক্ষেপ হলো এফসিডি। এর কাজ ছিল বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর গোয়েন্দাগিরি। মিত্রোখিন তথ্য প্রকাশ করেছেন, এফসিডির দক্ষিণ এশীয় বিভাগে যারা নতুন আসতেন, স্টালিনের ওই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাদের পয়লা সবক। এফসিডি কর্তারা মানচিত্রের সাহায্যে কেজিবিতে নবাগতদের ১৯৪৭ সালের দেশভাগ-পরবর্তী দুই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান দেখাতেন।

'ষাটের দশকের শেষে ক্রেমলিন দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, পাকিস্তানের পৃথকীকরণ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম অংশের বিভক্তি সোভিয়েতের সঙ্গে ভারতের স্বার্থও রক্ষা করবে।' *(মিত্রোখিন আর্কাইভ-টু, কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, পেঙ্গুইন গ্রুপ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৪৭)*। লক্ষণীয়, এই মন্তব্য সম্পর্কে ৫৬৮ পৃষ্ঠায় অ্যান্ড্রু লিখেছেন, 'মিত্রোখিন অবশ্য এমন কোনো নোট লিখেননি, যা থেকে এমন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব।'

মিত্রোখিনের এই দাবির ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্দোলনের গৌরব মহিমা কি আদৌ কিছুটা ম্লান হতে পারে? প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ ও অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন: 'প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন একান্তভাবেই এ দেশের মাটি ও মানুষের চিন্তা ও আবেগপ্রসূত। কেজিবি এ ধরনের সিদ্ধান্তে না পৌঁছালেও ফলাফল একই হতো।'

কেজিবি দেখেছে, ভারতের শাসক কংগ্রেসের তুলনায় স্নায়ুযুদ্ধের অধিকাংশ সময়জুড়ে সামরিক জান্তা নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান সরকারে অনুপ্রবেশ অধিকতর জটিল। এ ছাড়া ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধও ঘোষিত হয়। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪১)*। অন্যদিকে ১৯৫৫ সালে ক্রুশ্চেভের ভারত সফরকালে নেহরু তাকে সঙ্গোপনে কেজিবির নাম উল্লেখ না করে বলেন, তিনি ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পর্কে অবগত আছেন *(মাই ইয়ার্স উইথ নেহরু, মল্লিক)*। বস্তুত এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব ঠেকাতে পাকিস্তানকে কাউন্টারওয়েট বা কৌশলগত প্রতিসাম্য হিসেবে ব্যবহারের মার্কিনি সিদ্ধান্তের উদ্যোগে ভারতকে মস্কোর দিকে ঝুঁকতে উৎসাহিত করে। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩১৪)*

ভারতীয় উপমহাদেশে কেজিবি কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হলে সৃষ্টি হয় এফসিডির নতুন বিভাগ *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩২১)*। তবে আইয়ুব খানের জমানায় ও তারপরও পাকিস্তানে কেজিবির তৎপরতার মূল লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্দেহ-সংশয় ছড়ানো। ১৯৬৫-এর সেপ্টেম্বরে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের স্বল্প মেয়াদি অথচ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র পিন্ডিকে সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানকে তার প্রয়োজনের মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ পরিত্যাগ করার তিক্ততাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে কেজিবি মরিয়া হয়ে ওঠে। কেজিবির প্রভাব বিস্তারকরণ অপারেশনের মূল টার্গেট ছিল আইয়ুব খানের ডাকসাইটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। উল্লেখ্য, ভুট্টো সম্পর্কে বরাবরই এই ধারণা ছিল যে, তিনি যেকোনো মূল্যে প্রধানমন্ত্রীর পদ পেতে উন্মুখ ছিলেন। একাত্তরের ডিসেম্বরে পৌঁছে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি 'উপ-প্রধানমন্ত্রী' হতে প্রস্তুত। তবে তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে।

মিত্রোখিন ১৯৬১ সালের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা ভুট্টোর উক্তরূপ মনোভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মিত্রোখিনের বর্ণনায়: ভুট্টো প্রাকৃতিক সম্পদমন্ত্রী থাকাকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মিখাইল স্তেভানোভিচ কাপিতসা ও তার স্ত্রীকে তার পৈতৃক বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। এ সময় উর্দুভাষী এক তরুণ রুশ কূটনীতিক লিওনিদ শেবারশিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গী হন। তিন বছর পর তাকে বদলি করা হয়

কেজিবিতে (শিবারশিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে দিল্লিতে কেজিবি মিশন প্রধান ও পরে এ সংস্থার দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন)। তিনি উল্লেখ করেন, ভুট্টো তার কথাবার্তায় এটা স্পষ্ট করেন যে, তিনি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হওয়া। শেবারশিন লিখেছেন, ভুট্টোর আলাপ-আলোচনা ছিল 'অপ্রতিরোধ্যভাবে সাহসী, এমনকি নৈরাজ্যমূলক। মনে হলো ভুট্টো পাকিস্তানে মার্কিন প্রভাব নির্মূলে বদ্ধপরিকর এবং তিনি তার এই লক্ষ্য অর্জনে সোভিয়েতের সহায়তা চান।' *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৩)*

১৯৬৭ সালের শেষের দিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো পিপিপি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তার জনপ্রিয় স্লোগান ছিল ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের ভিত্তি, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনৈতিক নীতি। সব ক্ষমতা জনগণের হাতে। পিপিপির প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রকাশিত এক দলিলে এই স্লোগানকে একটি বাক্যে মূর্ত করা হয় এভাবে: পাকিস্তানকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর ঘটানোই পিপিপির লক্ষ্য।

তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনদানের মাধ্যমে আমেরিকা এবং পুঁজিবাদ ঘায়েলের তত্ত্ব সাফল্যের সঙ্গে প্রথম হাজির করেন ক্রুশ্চেভ *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৮)*। ১৯৬৪ সালে তার স্থলাভিষিক্ত হন লিওনেদ ব্রেজনেভ। এ সময় স্নায়ুযুদ্ধে তৃতীয় বিশ্ব জয়ের স্বপ্নে ক্রেমলিন অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কেজিবির সদর দপ্তর অনেক বেশি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালে ইউরি আন্দ্রপভ কেজিবি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই একে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৯-১০)*। একাত্তরে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আনাতলি দোবরিনিন তার *ইন কনফিডেন্স* বইতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে লিখেছেন, 'তৃতীয় বিশ্ব তার আগ্রহের মুখ্য বিষয় ছিল না। উপরন্তু আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঐতিহ্যগতভাবে তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সম্পৃক্ত ছিল না। এই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগ, এর প্রধান ছিলেন বরিস পনোমারিয়েভ।' মিত্রোখিন লিখেছেন, তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রবর্তী নীতি এভাবেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের সমর্থনে কেজিবি দ্বারা পরিচালিত হতো। ব্রেজনেভের পলিটব্যুরোর সামনে আন্দ্রপভ ও গ্রোমিকোই কালক্রমে উল্লেখযোগ্য সব বিদেশনীতির যৌথ প্রস্তাবক হয়ে ওঠেন *(দোবরিনিনের বরাতে মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-১১)*।

অ্যান্দ্রু লিখেছেন, 'ষাটের দশকে নতুন নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ফলে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পাশ্চাত্য তার পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। উদীয়মান ন্যাম জোট ক্রমশ পশ্চিমের তুলনায় সোভিয়েতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধ জয়ে কেজিবি ন্যামকে দেখেছে 'স্বাভাবিক বন্ধু' হিসেবে।'

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের ভূমিকাই ছিল প্রধান। অথচ অধ্যাপক ক্রিস্টোফার অ্যান্দ্রু ও মিত্রোখিনের বিবরণে বিষয়টি সে দৃষ্টিভঙ্গিতে একেবারেই উল্লিখিত হয়নি। তাদের বর্ণনায়: ১৯৬৮-৬৯-এর শীতকালে পিপিপি ভুট্টোর গতিশীল নেতৃত্বে এমন এক জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলে, যা '৬৯-এর মার্চে আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করে। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা চলে যাওয়ার কথা স্পিকারের কাছে। কিন্তু সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান সংবিধান স্থগিত করে দিয়ে ঘোষণা করেন সামরিক আইন।

'সত্তরের ডিসেম্বরের নির্বাচনে কেজিবি আওয়ামী লীগের পক্ষে গোপন প্রচার চালায়।' এরপর মিত্রোখিন উল্লেখ করেন, এমন কোনো সাক্ষ্য নেই যে, এর ফলাফলে কেজিবির তৎপরতার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৮)* তোফায়েল আহমেদ এ প্রতিবেদককে বলেন, সত্তরের নির্বাচনে কেজিবির ভূমিকা রাখার কোনো প্রশ্নই আসে না। সিপিবির নিজেরই অস্তিত্ব ছিল না। তারা ছিল ন্যাপের ব্যানারে। একমাত্র সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মোজাফফর ন্যাপ থেকে নির্বাচিত হন। মিত্রোখিন পরিহাসের সঙ্গে লিখেছেন, তবে এটা অস্বাভাবিক হতো যে, কেজিবি সদর দপ্তর পলিটব্যুরোর কাছে ওই নির্বাচনবিষয়ক ফলাফলের রিপোর্ট করতে গিয়ে তাদের নিজের জন্য উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দাবি করতে ব্যর্থ হয়েছে। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৮)*

মিত্রোখিনের বর্ণনায়, পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮ আসনের মধ্যে পিপিপি পায় ৮১টি আসন। কাইউম মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র নয়টি আসন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন জিতে নেয়। মুজিব যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পাননি; কিন্তু ন্যাশনাল এসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হন। ভুট্টো আইয়ুব খান ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করে মুজিবকে ক্ষমতা লাভের সুযোগ বঞ্চিত করেন।

কেজিবি সদর দপ্তর পলিটব্যুরোর কাছে রিপোর্ট দেয় যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতার অবসান আসন্ন। *(চলবে)*

মিজানুর রহমান খান: সাংবাদিক।

পঞ্চম কিস্তি: 'মুজিব জানতেন না পিছু নিয়েছে কেজিবি'